শব্দার্থ ও টীকা

30

বোধ পরীক্ষণ

30.1 প্রস্তাবনা

লেখাপড়ার বিষয়ে 'আমরা স্বনির্ভর'— এ-কথা যত সহজে বলা যায় ব্যাপারটা তত সহজ নয়। স্বনির্ভরতার নানা মাত্রা বা স্তর আছে। আংশিক স্বনির্ভরতার থেকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবার জন্য আমাদের যথেষ্ট চেষ্টা থাকা চাই। সাধারণত দেখা যায়, গৃহশিক্ষকের উপর শিক্ষার্থীরা খুব নির্ভরশীল। শিক্ষক লিখিয়ে দেন, ছাত্রছাত্রীরা অনেকে মুখস্থ করে। তাদের আশা মুখস্থ বিদ্যার জোরে পরীক্ষায় উতরে যাবে। তার ফলে পরীক্ষার খাতায় অনেক হাস্যকর ভুলও দেখা যায়। তাতে বোঝা যায়, পাঠ্যবিষয় ঠিকমতো বোধগম্য হয়নি। 'বোধ পরীক্ষণ' পাঠটি আমাদের এগোতে সাহায্য করবে। আমরা নিজেরাই বিচার করতে পারব, আমরা যতটা বুঝতে পারছি তা ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারছি কিনা।

30.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনারা—

- বোধ পরীক্ষণ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দিতে পারবেন;
- উদ্ধৃত বিষয়ের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।

30.3 বিষয়ের রূপরেখা

30.3.1 বোধ পরীক্ষণ বলতে কী বোঝায়?

রোজই আমাদের কিছু-না-কিছু পড়তে হয়। খবরের কাগজ, রাস্তার ধারের বিজ্ঞাপন, আবার বইপত্রও। এই পড়া তো শুধু পড়া নয়, পড়ে বোঝা। আবার শুধু বুঝলেই হবে না, কী বোঝা গেল তা প্রকাশ করে অপরকে বুঝিয়ে দেওয়া চাই। বোধ পরীক্ষণের প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহার করতে হবে চলিত ভাষা, প্রত্যক্ষ উক্তি পরিণত হবে পরোক্ষ উক্তিতে। প্রশ্নের উত্তরে বাড়তি কথা লেখা চলবে না, যতটুকু উত্তর চাওয়া হয়েছে ততটুকুই শুধু লিখতে হবে। এভাবে প্রকাশ করতে গেলে নিজের কাছেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, পঠিত বিষয়টি কতখানি বোধের মধ্যে এসেছে। ঘরে-বাইরে আমরা অনেক কিছু পড়ি— ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান রাজনীতির বিষয়, খেলার খবর, আরও কত-কী। বোধ পরীক্ষণের অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে পাঠ্য বহির্ভূত যে-কোনো প্রশ্নের

শব্দার্থ ও টীকা

উত্তর বা বক্তব্যের প্রকাশ সহজে করা যায়। তবে লিখতে গেলে ভাষার উপর দখল থাকা চাই। ভাবনা ও অনুভূতি আমরা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করি। মাধ্যমটিকে আয়ত্ত করতে না-পারলে ভাষা অশুদ্ধ হবে, লেখা আটকে যাবে। সব সময় মনে রাখতে হবে সহজ ভাষায় লেখা অনুশীলন সাপেক্ষ।

পাঠগত প্রশ্ন : 30.1

1. বোধ পরীক্ষণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর কীভাবে লেখা উচিত? (অনধিক চারটি বাক্যে উত্তর দিন)

2. ভাষা-মাধ্যমকে আয়ত্ত করা খুব দরকার কেন?

30.3.1 বোধ পরীক্ষণ বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত

(1)

কত্তাবাবা (রবীন্দ্রনাথ) মাঝে মাঝে জোড়াসাঁকোয় অভিনয়ের আয়োজনে মাতিয়ে তুলতেন সবাইকে। শান্তিনিকেতনের দল যখন তৈরি হয়নি তখন যা-কিছু করত কলকাতার দল। কলকাতায় এসে কত্তাবাবাকে দল সংগ্রহ করতে হত। দাদামশায়দের (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরদের) টানতেন, অন্যান্য আত্মীয়-বন্ধুরা এসে যোগ দিতেন, শান্তিনিকেতনেরও কেউ কেউ আসতেন। এইভাবে দল গড়ে উঠত। জোড়াসাঁকো হত জমজমাট। বাড়ির রূপই বদলে যেত। লেখাপড়া প্রায় হতই না আমাদের। খেলাও বন্ধ হয়ে আসত।

রিহার্সাল আরম্ভ হলে আমরা লক্ষ করতুম যে আমাদের ছোটোদের মধ্যে থেকে একমাত্র খুকিমাসি (অবনীন্দ্রনাথের কন্যা সুরূপা) ছাড়া আর কারুর কত্তাবাবার দলে ঢোকবার ডাক আসত না। খুকিমাসি 'ডাকঘর'-এ মালিনীর পার্ট করে খুব নাম করেছিল। সেই থেকে তার কদর। বাকিদের করবার মতো পার্ট তাঁর নাট্যে থাকত না। কিংবা এমনও হতে পারে যে আমাদের কাউকে তিনি উপযুক্তই মনে করতেন না। এর ফলে আমরা দর্শকের কোঠায় পড়ে থাকতুম। অবশ্য দিনের পর দিন প্রতি সন্ধ্যায় রিহার্সাল দেখে ভারী আমোদ পেতুম— পার্ট সব মুখস্থ হয়ে যেত— কত্তাবাবার শেখানো ঢংগুলো পর্যন্ত। তার ফলে যতদিন তালিম শুনতুম ততদিন অভিনয় করতে না-পারার কোনো দুঃখ আমাদের মনকে স্পর্শ করত না। কিন্তু অভিনয় সাঙ্গ হয়ে গেলে দল ভেঙে যে-যাঁর পথে চলে গেলে, কত্তাবাবা শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলে আমাদেরও থিয়েটার করবার শখ জাগত মনে।

(মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়: দক্ষিণের বারান্দা)

প্রশ্ন :

১) উদ্ধৃত অংশে অভিনয়ের কোন্ দুটি দলের কথা বলা হয়েছে?

২) রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের দল গড়ে উঠত কীভাবে?

৩) ক) অভিনয় করার জন্যে ছোটোদের মধ্যে কার ডাক পড়ত?

খ) কেন তার ডাক পড়ত?

৪) কারা কেন দর্শক হয়েই থাকত?

শব্দার্থ ও টীকা

৫) অভিনয় না-করার দুঃখ কেন ছোটোরা ভুলে যেত?

৬) কখন ছোটোদের মধ্যে অভিনয় করার শখ জাগত?

৭) অবনীন্দ্রনাথ লেখকের দাদামশায়, তাহলে লেখক অবীনন্দ্রনাথের কে?

উত্তর :

১) কলকাতার দল ও শান্তিনিকেতনের দলের কথা বলা হয়েছে।

২) কলকাতায় এলে রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ের দল গড়ে তুলতেন। দলের মধ্যে নিয়ে আসতেন অবনীন্দ্রনাথদের, আত্মীয় ও বন্ধুদের ডাক দিতেন, আর থাকতেন শান্তিনিকেতনের কয়েকজন। এই ভাবে গড়ে উঠত কলকাতার দল।

৩) ক) অবনীন্দ্রনাথের কন্যা সুরূপা বা 'খুকুমাসি'র ডাক পড়ত।

খ) 'মালিনী' নাটকে ভালো অভিনয় করেছিল খুকুমাসি, তাই অভিনেত্রী হিসেবে তার খুব সমাদর ছিল। এই পরীক্ষিত অভিনয়-প্রতিভার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাকে দলের মধ্যে নিতেন।

৪) অবনীন্দ্রনাথ এবং অন্য ছোটো ছেলেমেয়েদের অভিনয়ের যোগ্য কোনো ভূমিকা নাটকে থাকত না। অথবা রবীন্দ্রনাথ হয়তো অন্য কোনো ছোটোকে অভিনয়ের উপযুক্ত মনে করেন নি। কাজেই ছোটোরা দর্শক হয়েই থাকত।

৫) প্রতিদিন সন্ধ্যায় নাটকের মহলা হত। সে ছিল ভারী আনন্দের অভিজ্ঞতা। দেখতে দেখতে সকলের পার্ট স্মৃতিতে গেঁথে যেত। রবীন্দ্রনাথ অভিনেতাদের যে-ভঙ্গি শেখাতেন সে-সব তারা আয়ত্ত করে ফেলত। ফলে মহলা চলতে থাকলে অভিনয় না-করতে পারার দুঃখ মন থেকে মুছে যেত।

৬) একসময় অভিনয় সাঙ্গ হত, নাটক মঞ্চস্থ হয়ে যেত। অভিনেতারা বিদায় নিতেন। রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনে ফিরে যেতেন। আনন্দের দিন শেষ হত ছোটোদেরও। এই সময় তাদের মধ্যে জেগে উঠত নাটক করার আগ্রহ।

৭) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

(2)

দরজার সম্মুখে বসিবার উপায় নাই, জলে ভিজিয়া গিয়াছে। নীল ডোরাকাটা ইজারটি দিয়া জল মুছিয়া লইলাম। ইজার ময়লা হইলেও আর ক্ষতি নাই। কাল তো আর ওটি পরিতে হইবে না। নয় বৎসর আগে ভূমিকম্পের সময় মেঝেতে এই স্থানে গর্ত হইয়া গিয়াছে। আজ পর্যন্ত সেই অবস্থাতেই রহিয়া পি.ডব্লু.ডি'র কর্মনিষ্ঠার সাক্ষ্য দিতেছে। এক নম্বর সেলে যে থাকে তাহার আবার এত বাছ-বিচার! ফাঁসির মঞ্চ হইতে যে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী তাহারই দাবি এই ঘরের উপর সবচেয়ে বেশি। সেলের সাড়ে চার হাজার বাসিন্দার মধ্যে এই ঘরের উপর আমারই দাবি সর্বোচ্চ। পি.ডব্লু.ডি.-র লোকেরা ঠিকই ভাবিয়াছে— ভিজা মেঝের উপর বসিয়া বাতগ্রস্ত হইতে যতদিন সময়ের দরকার, এ-বাসিন্দাকে ততদিন বাঁচিতে হইবে না। আজিকার দিনেও কিন্তু

শব্দার্থ ও টীকা

মনে হইতেছে, এই ভিজার উপরে বসিয়া অসুখ করিতে পারে। একটা গল্প পড়িয়াছিলাম,— একজন লোক আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত। বিষের শিশি মুখের কাছে লইয়া গিয়াছে। হঠাৎ তাহার বন্ধু বাহির হইতে ইহা দেখিয়া, পিস্তলটি তাহার দিকে নিশানা করিয়া বলিল, 'ফেলে দে বলছি গেলাসটা, না হলে এখুনি গুলি করলাম।' হাত হইতে গ্লাস পড়িয়া গেল। কে বুঝিতে পারে মনের এই গতি! . . . হয়তো দরজার সম্মুখের এই গর্তটি ভূমিকম্পের পর মেরামতের সময় নজরে পড়ে নাই। কী কাণ্ড সেবার ভূমিকম্পের সময়! ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পের কথা বলিতেছি। পাটনা ক্যাম্প জেল হইতে উত্তর বিহারের সকল রাজবন্দীকে গভর্নমেন্ট ছাড়িয়া দিল— ভূমিকম্পপীড়িত জনগণের সেবার জন্য।

(সতীনাথ ভাদুড়ী: জাগরী)

প্রশ্ন :

1. ঠিক উত্তরে টিক(✓) দিন—

বক্তা কোথায় বসেছিলেন?

(ক) একটি গর্তের উপর।
(খ) ঘরের বাইরে বারান্দায়।
(গ) জেলখানার একটি ঘরে।
(ঘ) নিজের বাড়ির একটি ঘরে।

2. দরজার সামনে বসবার উপায় ছিল না কেন?

3. ইজার ময়লা হলেও ক্ষতি নেই কেন?

4. দরজার সামনে কেন গর্ত হয়েছিল?

5. গর্তটি থাকার জন্য বক্তার কী অসুবিধে হচ্ছিল?

6. পি.ডব্লু.ডি.-র কর্মনিষ্ঠার কথা কেন উঠল?

7. নির্দিষ্ট ঘরটির উপর কার দাবি কেন সর্বোচ্চ?

8. পি.ডব্লু.ডি.-র লোকেরা ঠিকই ভেবেছে কোন্ কথা?

9. বক্তার একটি গল্প মনে পড়ল, কী সেই গল্প?

10. কেন ওই গল্পটিই বক্তার মনে এল?

11. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন:

ক) কত সালের ভূমিকম্পের কথা বক্তা বলেছেন?
খ) ভূমিকম্পের পর গভর্নমেন্ট কী পদক্ষেপ নিয়েছিল?
গ) কেন ওই বিশেষ পদক্ষেপের কথা বক্তার মনে পড়ল?

12. বক্তার জীবনের যে-ঘটনার কথা এখানে বলা হয়েছে তা কত খ্রিস্টাব্দের?

উত্তর :

1. গ

2. দরজার সামনেটা জলে ভেজা, তাই বসার উপায় নেই।

শব্দার্থ ও টীকা

3. পরের দিন ইজারটি আর পরতে হবে না। তাই সেটা ময়লা হলেও ক্ষতি নেই।

4. ভূমিকম্পের কারণে দরজার সামনে গর্ত তৈরি হয়েছিল।

5. গর্তে জল জমে, দরজার সামনেটা ভিজে যায়। তাই সেখানে বসার অসুবিধে।

6. গর্ত সারানোর দায়িত্ব পি.ডব্লু.ডি.-র। গর্তটা ন-বছর ওখানে রয়ে গেছে, তবু তারা সারায়নি। তাতে পি.ডব্লু.ডি.-র কর্মনিষ্ঠার অভাবই প্রমাণিত হয়। কিন্তু বক্তা উলটো কথা বলেছেন— গর্তটা কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিচ্ছে। স্বভাবতই মন্তব্যটি ব্যঙ্গাত্মক।

7. বক্তা ফাঁসির অপেক্ষায় আছেন, তাঁর দাবি সর্বোচ্চ। ফাঁসির মঞ্চ থেকে সবচেয়ে কাছে যে-ঘর, সেই ঘরে বক্তাকে রাখা হয়েছে। যাঁর ফাঁসির দিন সবচেয়ে কাছে চলে এসেছে তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট থাকে এই ঘর। বক্তার ফাঁসির সময় ঘনিয়ে আসছে, তাই তাঁর অবস্থান ওই ঘরে।

8. ওই বিশেষ ঘরের বাসিন্দাকে ভিজে মেঝের ওপর থাকতে হবে। তাতে বাতব্যাধিতে মরবে। কিন্তু সে ব্যাধি ধরতে যে-সময় লাগার কথা তার আগেই বাসিন্দার ফাঁসি হয়ে যাবে। সুতরাং গর্ত বোঝানো নিরর্থক— এই কথাই ভেবেছে পি.ডব্লু.ডি।

9. গল্পটি আত্মহত্যায় উদ্যত একজন মানুষের। তিনি আত্মহত্যার জন্য মুখের কাছে বিষের শিশি নিয়ে এসেছেন। এমন সময় তাঁর বন্ধু বাইরে থেকে ব্যাপারটা দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল তাক করে শিশিটা ফেলে দিতে হুকুম করলেন, না-ফেললে সেই মুহূর্তেই তিনি গুলি করবেন। সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা-করতে-যাওয়া মানুষটির হাত থেকে বিষের শিশি খসে পড়ল।

10. বক্তার ফাঁসির সময় ঘনিয়ে আসছে। অথচ তিনি ভাবছেন— ভিজে মেঝেতে বসলে তাঁর অসুখ করবে। তাঁর মনের অবস্থার সঙ্গে মিল আছে গল্পে কথিত মানুষটির। তাই এই সময় গল্পটি তাঁর মনে পড়ল।

11. (ক) ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পের কথা বক্তা বলেছেন

(খ) ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত মানুষদের সাহায্য করবেন তাই পাটনা ক্যাম্প জেল থেকে উত্তর বিহারের সব রাজবন্দিকে সরকার মুক্তি দিয়েছিল।

(গ) পাটনা জেল থেকে আকস্মিকভাবে মুক্তি পেয়েছিলেন রাজবন্দিরা। কত আকস্মিক ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে। এমন কোনো ঘটনা মৃত্যুপথযাত্রী বক্তার জীবনেও ঘটতে পারে— এই রকম কোনো ভাবনা লুকিয়ে ছিল বক্তার মনের গহনে। একটু আগেই তিনি মন্তব্য করেছেন— মানুষের মনের গতি কী বিচিত্র। সেই বিচিত্র গতিরই নিদর্শন মিলল বক্তার ভাবনায়।

12. ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের কথা এখানে বলা হয়েছে।

(3)

অদ্ভুত সেই হরিণ দেখে সীতা খুশি হয়ে রামকে ডেকে বললেন, প্রভু, তুমি শিগ্‌গির লক্ষ্মণকে নিয়ে এখানে এসো। রাম সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ্মণের সঙ্গে সেখানে আসতেই হরিণটাকে দেখতে পেলেন। লক্ষ্মণের মনে সন্দেহ হল। তিনি বললেন, মনে হচ্ছে মারীচই এই হরিণের রূপ ধরেছে। রাজারা বনে মৃগয়া করতে এলে দুষ্ট মারীচ হরিণ সেজে তাদের মৃত্যু ঘটায়। এই রকম রত্নময় হরিণ থাকা অসম্ভব। এ নিশ্চয় রাক্ষসী মায়া। সীতা কিন্তু ছলনায় মুগ্ধ হয়ে আছেন। লক্ষ্মণের কথা শুনে রামকে বললেন, তুমি ওই হরিণ আমায় এনে দাও। আমি

শব্দার্থ ও টীকা

ওকে নিয়ে খেলা করব। তুমি যদি ওকে জীবন্ত ধরে আনতে পারো, তাহলে বনবাস শেষ হলে আবার যখন রাজ্যে ফিরে যাব, তখন এই হরিণ আমাদের শোভার সামগ্রী হয়ে থাকবে। ভরত, শাশুড়িরা আর আমি অবাক হয়ে দেখব। আর যদি মারাও যায়, ওর ওই সুন্দর চামড়া আমরা ব্যবহার করতে পারব। ঘাসের উপর সোনার চামড়া বিছিয়ে আমরা বসতে পারব। রাম সীতার কথা শুনে এবং সোনার বরন হরিণ দেখে উল্লাসের সঙ্গে লক্ষ্মণকে বললেন, আজ এই হরিণ তার অসামান্য রূপের জন্য আমার হাতে বিনষ্ট হবে। পৃথিবীর কথা দূরে থাক, স্বর্গের বাগানেও এমন জিনিস আর নেই। এর মুখমণ্ডল ইন্দ্রনীলময় (নীলকান্তমণিময়) পানপাত্রের মতো সুন্দর, উদর শঙ্খ ও মুক্তার মতো মনোহর। এমন মনোহরণ স্বর্ণমৃগকে দেখলে কার-না লোভ হয়। রাজারা মাংসের জন্য হোক বা ক্রীড়ার জন্য হোক, বনে গিয়ে হরিণ বধ করেন। তুমি সীতার পাহারায় থাকো, এ যদি মারীচ হয় তাহলে তাকে হত্যা করব, আর যদি সত্যিই মৃগ হয় তাহলে ধরে আনব।

(জ্যোতিভূষণ চাকী: গদ্যে বাল্মীকি রামায়ণ)

প্রশ্ন :

1. হরিণটিকে দেখে লক্ষ্মণ কী বললেন?
2. হরিণ নিয়ে সীতা কী করতে চান?
3. সীতা লক্ষ্মণের কথা শুনেও শুনলেন না কেন?
4. হরিণটি দেখে রামচন্দ্রের লোভ হল কেন?
5. রামচন্দ্র হরিণের পিছনে ধাওয়া করে কী করবেন?
6. উদ্ধৃত অংশে সীতার চরিত্রের কী পরিচয় আমরা পাই?
7. রাম ও লক্ষ্মণ— এই দুই চরিত্রের মধ্যে কী পার্থক্য আমরা লক্ষ করি?
8. উদ্ধৃত অংশ থেকে শব্দ নিয়ে একপদে পরিণত করুন।
   - ক) যা রত্ন দিয়ে আচ্ছন্ন
   - খ) যার জীবন আছে
   - গ) পান করার জন্য পাত্র
   - ঘ) যা মন কাড়ে।

উত্তর :

1. হরিণ দেখে লক্ষ্মণ তাঁর সন্দেহ ব্যক্ত করে বলেছেন, মারীচ হরিণের চেহারা নিয়ে তাঁদের সামনে হাজির হয়েছেন। রাজারা যখন অরণ্যে শিকার করতে আসেন তখন দুষ্ট মারীচ হরিণের রূপ ধরে তাঁদের ভোলায়। হত্যা করে। লক্ষ্মণ নিশ্চিত, এমন রত্নদেহী হরিণ অবাস্তব, সুতরাং এ হল রাক্ষসের ছলনা।
2. রাম যদি হরিণকে জীবন্ত ধরে আনতে পারেন, তাহলে সীতা তার সঙ্গে খেলা করবেন। তারপর বনবাসপর্ব শেষ হলে হরিণটি নিয়ে ফিরবেন নিজেদের রাজ্যে, সেখানে হরিণ হবে এক দর্শনীয় জিনিস। ভরত ও শাশুড়িদের সঙ্গে সীতা তাকে অবাক দৃষ্টি মেলে দেখবেন। আর রামচন্দ্র যদি তাকে মৃত অবস্থায় আনেন, তাহলেও হরিণের সুদৃশ্য চামড়া হবে তাদের ব্যবহারের সামগ্রী, ঘাসের উপর স্বর্ণময় চামড়া পেতে তাঁরা বসতে পারবেন।

3. মারীচের ছলনায় সীতা মুগ্ধ হয়েছিলেন, হরিণের প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ জন্মেছিল, তাই লক্ষ্মণের বক্তব্য তিনি উপেক্ষা করেছেন।

4. এমন হরিণ সম্পূর্ণ দুর্লভ। তার মুখমণ্ডল নীলকান্তমণিখচিত পানপাত্রের মতো অপূর্ব, তার উদর শাঁখ ও মুক্তার মতো মনোহারী। এই দুর্লভ সৌন্দর্য রামচন্দ্রের মনে লোভের জন্ম দিয়েছিল।

5. হরিণটি যদি ছদ্মবেশী মারীচ হয় তাহলে রামচন্দ্রের হাতে সে নিহত হবে, আর ওটি যদি সত্যিই হরিণ হয় তাহলে তাকে ধরে নিজেদের কুটিরে নিয়ে আসবেন।

6. সীতা রত্নময় হরিণ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। সেই মুগ্ধতা এতই গভীর যে লক্ষ্মণের যুক্তি তাঁকে কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। তিনি নিশ্চিত যে ওটা হরিণই। কোনো সন্দেহ বা আশঙ্কার কথা তিনি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেননি। তিনি ভাবছেন, সুন্দর হরিণটির সঙ্গে বনবাসজীবনে তিনি খেলা করবেন, জীবনযাপনের মধ্যে বৈচিত্র্য আনবেন। ভরত ও শাশুড়িদের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ আছে তাঁর কথার মধ্যে— সকলে মিলে তাঁরা উপভোগ করবেন হরিণের সৌন্দর্য। আমরা আরও দেখতে পাই, সোনার চামড়া তাঁরা ব্যবহার করবেন, সেটি পেতে বসবেন— এসব ভাবতেও সীতার ভালো লাগছে। এই আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে সুরুচিসম্পন্ন জীবনের প্রতি সীতার আকর্ষণ প্রকাশিত হয়েছে।

7. স্বর্ণমৃগ রামচন্দ্রকে মুগ্ধ ও লুব্ধ করেছে। লক্ষ্মণের কথায় মোহ ও লোভের কোনো পরিচয় নেই।

লক্ষ্মণ বুঝেছেন, এমন বিচিত্র হরিণের অস্তিত্ব অসম্ভব। এমন বোধের পরিচয় রামচন্দ্রের কথায় আমরা পাই না।

লক্ষ্মণ হরিণের মধ্যে দেখেছেন মারীচকে। রামচন্দ্রের এমন স্বচ্ছ দৃষ্টি নেই।

রামচন্দ্র হরিণের পিছনে ধাওয়া করতে চেয়েছেন। লক্ষ্মণ এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব।

লক্ষ্মণ যুক্তির দ্বারা চালিত, রামচন্দ্র প্রধানত আবেগ-তাড়িত

8. (ক) রত্নময়
(খ) জীবন্ত
(গ) পানপাত্র
(ঘ) মনোহর বা মনোহরণ

30.4 আপনি যা শিখলেন

1. বোধ পরীক্ষণের জন্য প্রদত্ত বিষয় পড়ে বুঝতে;
2. সাধুভাষাকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করতে;
3. প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিণত করতে;
4. নিজের ভাষায় উত্তর দিতে।

পাঠান্ত প্রশ্ন : 30.5

নীচে অংশ পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দিন—

1. হস্তলিপি একটা শিল্প। যাঁরা ডিটেকটিভ হতে চান তাঁদের এই শিল্পের সঙ্গে ভালো পরিচয় থাকা

শব্দার্থ ও টীকা

দরকার। হস্তলিপির ব্যাখ্যা শিখতে হয়, কারণ হাতের লেখায় মনের ভাব ধরা পড়ে। সরল মনে লিখলে তার চেহারা একরকম হয়, অপরাধের চেতনা নিয়ে লিখলে আর-এক রকম। অপরাধ-চেতনা হাতের পেশিতে কাজ করে। হাতের লেখার সময় আঙুল বেশি ব্যবহৃত হয়, না হাত বেশি ব্যবহৃত হয় তা নিয়ে মতভেদ আছে। আমার মনে অক্ষরের ঊর্ধ্বমুখী আর নিম্নমুখী টানগুলি দিতে আঙুল ব্যবহৃত হয়, আর লেখাগুলি বাঁ ধার থেকে ডানধারে চালাতে হাত ব্যবহৃত হয়। কাজেই স্বাভাবিক লেখাতে দুইয়েরই ব্যবহার হয়ে থাকে। স্বাভাবিক লেখায় হাত সহজভাবে চলে, সমানভাবে চলে, কোথাও হঠাৎ বেশি চাপ পড়ে না। নকল লেখায় হাতের ঝাঁকুনি লাগে, দেখলেই বোঝা যায় অক্ষরগুলো লেখকের নিয়ন্ত্রণের অধীন ছিল না। লেখার সময় নিব যখন উপরের দিকে চলে তখন নিব কাগজে বিঁধে যায়। নকল লেখায় অক্ষরের উলটোদিকে চাপ পড়ে বেশি। তাতেও অনেক সময় নকল ধরা যায়। বেনামি চিঠিতেই এরকম থাকে বেশি। স্বাক্ষর বা হস্তাক্ষর যখন প্রতারণার জন্য নকল করা হয় তখন হাতের পেশির কাজই হয় বেশি। তখন আঙুল স্বাধীন ইচ্ছায় সহজ লিখন লিখতে পারে না। মনোযোগটা নকল করার দিকে বেশি চলে যায়।

(পরিমল গোস্বামী: ইংরাজ ডিটেকটিভের চোখে প্রাচীন কলকাতা)

প্রশ্ন :

1. ডিটেকটিভদের ভালো পরিচয় থাকা দরকার কীসের সঙ্গে?
2. স্বাভাবিক লেখায় হাতের চাপ হঠাৎ বেশি পড়ে না কেন?
3. স্বাভাবিক লেখায় আঙুল ও হাতের ব্যবহার কীভাবে হয়?
4. বেনামি চিঠিতে কোন্ বৈশিষ্ট্য বেশি কাজ করে?
5. কীভাবে বোঝা যবে অক্ষর লেখকের নিয়ন্ত্রণের অধীনে নেই?
6. আঙুলের চেয়ে হাতের পেশি বেশি কাজ করে কখন?
7. নকল করার সময় হাতের লেখা অস্বাভাবিক হয়ে যায় কেন?

2. মহাভারতের কর্ণ আমার সবচেয়ে প্রিয় চরিত্র। মহাভারতের নায়ক যদিও যুধিষ্ঠির, কিন্তু সর্বাংশে উজ্জ্বল পুরুষ অর্জুন। কিন্তু অর্জুন যেন স্রষ্টার আদুরে ছেলে। তিনি সব পান। তিনি সব প্রতিযোগিতায় জেতেন। অর্জুন বীর, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর জয় এমনই অবধারিত যে রোমাঞ্চ হয় না। অর্জুন যে কোনো সংকটের সম্মুখীন হলেই আমরা জানি তিনি ঠিক অপরাভূত হয়ে বেরিয়ে আসবেন।

কিন্তু কর্ণ প্রথম থেকেই হারছেন। জয়ী হবার মতন সমস্ত গুণ এবং সম্ভাবনাই ছিল তাঁর মধ্যে, তবু তিনি জেতেননি একবারও। অর্জুন পেয়েছিলেন তাঁর গুরুর আশীর্বাদ, কর্ণ পেলেন তাঁর গুরুর অভিশাপ, বিনা দোষে। অস্ত্র পরীক্ষার সময় কিংবা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় তাঁর অপমান আমাদেরও গায়ে বাজে। স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদী যখন কর্ণের বীরত্ব প্রমাণ করার আগেই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন তখন কর্ণ হেসেছিলেন। কী মর্মান্তিক সেই হাসি। বঞ্চিত অপমানিত মানুষের এরকম হাসি আমরা সহসা দেখি না। তাঁর দানের অহংকার ছিল প্রবল। ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র যখন তাঁর কবচকুণ্ডল চান, কর্ণ তা দিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি। তখনও কর্ণ হেসেছিলেন। ছদ্মবেশী ইন্দ্রকে যখন তিনি চিনে ফেলেছিলেন, তখন দানের সময় তাঁর ওষ্ঠে তাচ্ছিল্যের হাস্য ফুটে ওঠাই স্বাভাবিক মনে হয়। অনেক সময় জয়ের গৌরবের চেয়েও এই হাসির তাৎপর্য অনেক মহান হয়ে ওঠে।

কর্ণের চরিত্রে দোষ অনেক। যদি আমরা ধরে নিই যে গোটা মহাভারত একা বেদব্যাসের রচনা

শব্দার্থ ও টীকা

নয়, পরবর্তী অনেক কবিই এই মহাগ্রন্থের ওপর কলম চালিয়েছেন, তাহলে অনায়াসে একথাও বলা যায় যে, ওই সব প্রক্ষিপ্ত রচনাকাররা অনেকেই কর্ণবিদ্বেষী ছিলেন। কেউ বলেছেন, কর্ণ মহাবীর, আবার অনেকেই বলেছেন, তিনি কাপুরুষ। কেউ বলেছেন, কর্ণ অতিশয় উদার, আবার অনেকে বলেছেন, তিনি কুৎসিতভাষী ও নীচ। তবু এতসব হস্তাবলেপেও কর্ণ যেন আলাদাভাবে এক মহান ট্রাজেডির নায়ক।

(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্য এবং সাহিত্য)

প্রশ্ন :

1. একটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন:
   (ক) মহাভারতের সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র কোন্‌টি?
   (খ) গুরুর কাছ থেকে অর্জুন ও কর্ণ কী কী পেয়েছিলেন?
   (গ) দ্রৌপদী কোথায় কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করেন?
2. অর্জুনকে স্রষ্টার আদুরে ছেলে বলা হয়েছে কেন?
3. অর্জুনের বীরত্ব লেখককে রোমাঞ্চিত করে না কেন?
4. কর্ণ প্রথমবার কখন হেসেছিলেন?
5. কর্ণ দ্বিতীয়বার কখন হাসলেন?
6. কর্ণের দুটি হাসির বৈশিষ্ট্য কী?
7. মহাভারতের রচনাকার কে বা কারা?
8. কর্ণের চরিত্রে নানা দোষ ও গুণের যে একত্র সমাবেশ ঘটেছিল, তার কারণ কী?

4. ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ভাস্কো ডা গামা সসৈন্যে ভারত যাত্রা করিলেন। এবার বৈরনির্যাতনের প্রবল উত্তেজনায় পর্তুগিজ সেনাপতির ধর্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। গামা কালিকট আক্রমণ করিয়া নগর-প্রাচীরের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। বন্দরের মুসলমান বণিকবর্গের বাণিজ্যতরণী ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। কালিকটরাজের নৌসেনা গামার নিকট বন্দিবেশে আনীত হইল। গামা ৮০০ বন্দির নাসা কর্ণ ও হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া তাহা উপঢৌকন স্বরূপ কালিকট রাজাকে প্রেরণ করিলেন। ভারতবর্ষের লোক এরূপ নিষ্ঠুরতার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এখন ভাস্কো ডা গামার নাম ইতিহাসে সুপরিচিত হইয়াছে। তাঁর চরিত্রদোষ বিস্মৃত হইয়া ইতিহাস-লেখকগণ তাঁহার চরিত্রগুণেরই উল্লেখ করিতেছেন। কিন্তু সেকালের কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, গামা বীর হইলেও দস্যু, ধর্মোন্মত্ত হইলেও রাক্ষসের ন্যায় নিষ্ঠুর! গামার সহিত মালাবার-প্রবাসী যে সকল মুসলমান বণিকের কলহ ঘটিয়াছিল, তাঁহারা রাজা বা রাজপুরুষ ছিলেন না। গামা তাহাকে এশিয়া ও ইউরোপের— কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গের— জাতিগত কলহ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন।

মিশরের সুলতানের নিরীহ প্রজাবর্গ মক্কাতীর্থ দর্শন করিয়া একখানি অর্ণবপোতে (জাহাজে) আরোহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। আফ্রিকার পূর্বোপকূলের নিকটে আসিয়া গামার অর্ণবপোতের সহিত তীর্থযাত্রীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। যাহার নিকট যাহা ছিল, হাজিগণ সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া কেবল প্রাণভিক্ষা চাহিল। কিন্তু তাহারা যে সকলেই মুসলমান! গামা মুসলমান তীথযাত্রীদের কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া, তাহাদের অর্ণবপোত লক্ষ করিয়া গোলাবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একজন লিখিয়া গিয়াছেন, ''মুসলমান তীর্থযাত্রীবর্গের অর্ণবপোতে যে সকল রমণী ছিলেন তাঁহারা

শব্দার্থ ও টীকা

শিশুসন্তানগণকে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া বালকবালিকার প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। গামা অবিচলিত চিত্তে স্ত্রীহত্যায় শিশুহত্যায় নিবিষ্ট রহিলেন।

(অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়: ফিরিঙ্গি বণিক)

প্রশ্ন :

1. একটি বাক্যে উত্তর দিন—
   - ক) ভাস্কো ডা গামা কোন্ দেশের অধিবাসী?
   - খ) গামা কত খ্রিস্টাব্দে কাদের সঙ্গে পুনরায় ভারত-যাত্রা করেন?
   - গ) মক্কাতীর্থ-ফিরত মুসলমানরা কোন্ দেশের মানুষ?
   - ঘ) গামা কালিকটে কোথায় গোলাবর্ষণ করেন?
2. নীচের শব্দগুচ্ছের বদলে উদ্ধৃত অংশ থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে বসান—
   - ক) যা ভস্ম হয়ে গেছে।
   - খ) যে-মানুষের রং কালো।
   - গ) নিজের ধর্ম নিয়ে যিনি উন্মাদ।
   - ঘ) রাজার বা সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী।
3. ইতিহাস-লেখকরা ভাস্কো ডা গামাকে কীভাবে দেখাচ্ছেন?
4. সেকালের কাগজপত্র গামা সম্পর্কে কী সাক্ষ্য দেয়?
5. ভারতবর্ষের মানুষের প্রতি গামার নিষ্ঠুরতার দুটি দৃষ্টান্ত দিন।
6. গামা মালাবারের মুসলমানদের সঙ্গে বিরোধকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছেন?
7. হাজিরা প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলেন, কিন্তু গামা কী করলেন?
8. গামা কেন প্রাণভিক্ষার আবেদনে সাড়া দেননি?
9. মুসলমান তীর্থযাত্রীদের ওপর ভাস্কো ডা গামার অত্যাচার সম্পর্কে একজন লেখক কী বলেছেন?

5. গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাং-ওটাং এবং গিবন— প্রাণীজগতে আমাদের সবচেয়ে কাছের আত্মীয়। এই চারটি প্রাণীকে নর-বানর নাম দেওয়া হয়েছে। তবে গরিলারা অন্যদের থেকে অনেকটা আলাদা। জঙ্গলের মধ্যে একটি গরিলাদলের সঙ্গে আর-একটি দলের দেখা হলে বিবাদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে না। সম্পর্কটি থাকে শান্তিপূর্ণ, যেহেতু নিজেদের এলাকা বলে কর্তৃত্ব জাহির করার ঝোঁক ওদের নেই। এ-ব্যাপারটা অন্য নর-বানরদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। গরিলাদের দু-টো দল কাছাকাছি এলে একদলের কোনো সদস্য ইচ্ছে করলে স্থায়ীভাবে অন্যদলেও যোগ দিতে পারে। গরিলাদের দলগুলোর মধ্যে স্থিতিশীলতাই অবশ্য স্বাভাবিক ব্যাপার। দলপতি যদি হঠাৎ দল ছেড়ে বেরিয়ে যায় বা মারা পড়ে, তাহলেই ঘটে বিপত্তি। দলের অন্য সদস্যরা তখন দিশাহারা হয়ে পড়ে। ঘুরতে ঘুরতে অন্য কোনো দলের সদস্যভুক্ত হবার পর নতুন দলপতির অধীনে তারা মানসিক শান্তি ফিরে পায়। দলবদ্ধ জীবনযাপনের এই সুশৃঙ্খল প্রবণতা অন্য তিনটি নর-বানরের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

অর্থবোধক শব্দের মাধ্যমে কথা বলার ক্ষমতা গরিলাদের নেই। কথা বলার জন্য প্রয়োজনীয় বাগ্‌যন্ত্র ওদের আছে। নেই শুধু মগজের মধ্যে কথাবলার সেই বিশেষ এলাকাটি, চিন্তাভাবনাকে যা বাঙ্ময় রূপ দেবে। একমাত্র খাদ্য-সংগ্রহ করা ছাড়া গরিলাদের জীবনে আর-কোনো সমস্যা নেই। গরিলাদের

শব্দার্থ ও টীকা

মগজের আয়তন মাত্র ৬০০ থেকে ৬৫০ ঘন সেন্টিমিটার, মানুষের হল ১৬০০। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জে.বি.এস. হলডেন বলেছিলেন, ''একদল শিম্পাঞ্জিকে একটি জঙ্গলের মধ্যে ছেড়ে দাও, যেখানে ওদের প্রচুর খাদ্য প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। দেখবে, ওদের জীবনে কোনো সমস্যা দেখা দেবে না। কিন্তু দুটো মানুষকে একটি ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখো, দেখবে আধঘন্টার মধ্যেই অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।'' মানুষের সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব হল সমস্যা সৃষ্টি করা।

(শংকর চক্রবর্তী: বিবর্তনের পথে মানুষ)

প্রশ্ন :

1. একটি বাক্যে উত্তর দিন—
   - ক) কোন্ কোন্ প্রাণীকে নর-বানর বলা হয়?
   - খ) কোন্ নর-বানর অন্য সমজাতীয় প্রাণীর চেয়ে আলাদা?
   - গ) গরিলাদের দুটো দলের মধ্যে দেখা হলে এমন কোন্ ঘটনা ঘটে যা অন্য নর-বানরদের চেয়ে পৃথক?
   - ঘ) গরিলাদের জীবনের একমাত্র সমস্যা কী?
2. পাঠে উদ্ধৃত অংশ থেকে শব্দ বেছে নিয়ে একশব্দে পরিরত করুন—
   - ক) ভাষা বা বাক্যে রূপান্তরিত
   - খ) স্থায়ী অবস্থা
   - গ) দিক হারিয়েছে যে
3. গরিলাদের দলে স্থিতিশীলতায় কখন বিঘ্ন ঘটে?
4. স্থিতিশীলতায় বিঘ্ন ঘটলে গরিলারা কীভাবে তা ফিরে পায়?
5. গরিলাদের দুটি দলের মধ্যে বিবাদ ঘটে না কেন?
6. মগজের আয়তনের দিক থেকে গরিলা ও মানুষের তফাত কী?
7. গরিলাদের কথা বলার ক্ষমতা নেই কেন?
8. মানুষের সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব কী?
9. শিম্পাঞ্জি ও মানুষের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে হলডেন কী দৃষ্টান্ত দিয়েছেন?

6. একসময় বাউলগান সম্পর্কে আমার খুব আগ্রহ জেগেছিল। বারবার ছুটে গেছি কেঁদুলির মেলায়, শীতের মধ্যে সারা রাত জেগে বসে থেকেছি অজয় নদীর ধারে ছোটো ছোটো আখড়ায়। খুবই দুঃখের কথা, কয়েক বছরের মধ্যেই আমি বাউলগান সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ি। মন দিয়ে বারবার শুনলে বাউলগানেও একঘেয়েমি এসে যায়। তিন-চার রকমের বেশি সুরবৈচিত্র্য নেই। গানের মাঝে মাঝে 'ও ভোলামন' বলে একটি দমফাটানো তান আসলে শ্রোতাদের চমকে দেবার একটা কায়দা মাত্র। একসঙ্গে তিন চারটের বেশি বাউল-গান শোনা যায় না, তখন হাই ওঠে, কিংবা ফ্যাসানের বশবর্তী হয়ে কৃত্রিম বাহবা দিতে হয়। আসলে বাউলগানের কাছে আমাদের খুব বেশি প্রত্যাশা করাটাই ভুল। বাউলগান বাউলগানেরই মতন। আমরা তার থেকে আংশিক আনন্দ পেতে পারি মাত্র। সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতাই নগরকেন্দ্রিক। আমরা আর ইচ্ছে করলেই গ্রামীণ হয়ে যেতে পারি না। স্বতঃস্ফূর্ত গানের প্রতি আমাদের অন্তরীণ (অন্তর্নিহিত) বাসনা আছে বলেই আমরা বাউলগান বা লোকসঙ্গীতের কাছে গেছি বারবার। কিন্তু মন্দিরের সিঁড়িতে-বসা একান্ত বাউলগান বা ভেসে-যাওয়া নৌকোয় মাঝির গান শোনবার সৌভাগ্য

শব্দার্থ ও টীকা

আমাদের দু-একবারই হয়। বারবার পেতে গেলে সবকিছুর মধ্যেই একটা সাজানো ব্যাপার এসে পড়ে। মঞ্চে ওঠবার আগে বাউল প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে পরে নেয় গেরুয়া পোশাক, শ্রোতাদের দাবিতে মজার গান হিসেবে পরিবেশন করে এইরকম গান: 'এঁড়ে গোরু বেড়া ভেঙে খেজুর গাছে চড়েছে'। অতি উৎসাহে বাউল বা লোকসংগীত শিল্পীকে আমরা সরিয়ে আনি তার জীবনচর্যা থেকে। তার ফলে স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়ে যায়। ক্রমশ সেও আমাদের কৃত্রিম দ্রব্য সরবরাহ করতে থাকে।

(সুধীর চক্রবর্তী: বাউল ফকির কথা)

প্রশ্ন :

1. একসঙ্গে প্রকাশ করুন—
   - ক) নগরকে কেন্দ্র করে যা গড়ে ওঠে।
   - খ) যা আপনা থেকেই বিকশিত হয়।
   - গ) জীবনব্যাপী পালনীয় রীতি।
   - ঘ) বৈরাগীদের আশ্রম।
2. একটি বাক্যে উত্তর দিন—
   - ক) বাউলরা মাঝে মাঝে 'ও ভোলামন' গেয়ে ওঠে কী উদ্দেশ্যে?
   - খ) লেখক অজয় নদীর ধারে কোথায় বসে থেকেছেন?
   - গ) গান শুনতে শুনতে কখন হাই ওঠে?
3. বাউলগান শোনার আগ্রহে লেখক কী করেছেন?
4. গান শুনতে শুনতে একঘেয়েমি এসে যায় কেন?
5. মঞ্চে ওঠার আগে বাউল কী করে?
6. মঞ্চে শ্রোতাদের দাবি বাউলরা কীভাবে মেটায়?
7. বাউলগানের কাছে খুব বেশি প্রত্যাশা করা উচিত নয় কেন?
8. উদ্ধৃতাংশে কৃত্রিম দ্রব্য বলতে কী বোঝান হয়েছে বুঝিয়ে দিন।

30.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

30.1

1. মুখস্থ নয়, নিজের ভাষায়— সাধুভাষা থেকে চলিতে রূপান্তর— প্রত্যক্ষ উক্তি থেকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন— উত্তর হবে সংক্ষিপ্ত;
2. লেখা এলোমেলো হবে— লেখা আটকে যাবে।